শব্দ

জয়দেব গুপ্ত

(ধৃষ্টতা মাফ --- ঘনাদার গল্প লেখার চেষ্টা করলাম)

শব্দের তাণ্ডবে কানও গেছে, মাথাতেও ঝিম ধরেছে । আমার ধারণা আমাদের সবারই হৃদযন্ত্র অল্পবিস্তর জখম হয়েছে | সামনের মোড়ের মাথায় দুদিন ধরে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছিল । মাইক্রোফোনের একটা চোঙ আমাদের মেস বাড়ির দিকে মুখ করে লাগানো ছিল । এখনকার ঐ ডি. জে. না কি একটা বলে --- তারই কল্যাণে কান ও মাথা সহ গুমগুম শব্দে হৃদস্পন্দনও গোল পাকিয়েছে । বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে স্ফূর্তি আর সঙ্গে সোমরস প্রভাবিত প্যান্ট পরা শিব ঠাকুরদের তাণ্ডব নাচ । এই দুদিন আমরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি --- কারণ বললেও শোনা যাচ্ছিল না । মোবাইল ফোন বাজলেও শোনা যায়নি । এমনকি নিজেরাও কাউকে ফোন করতে পারিনি ।

এখন অবশ্য থেমে গেছে । এই রবিবারের বিকেলটা শান্তশিষ্ট লতার মত নেতিয়ে পড়ে আছে । ঘনাদা একটা বিজ্ঞান পত্রিকা নিয়ে আরামকেদারায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন । শিবু দুবার ঘনাদার পাশ দিয়ে চক্কর মেরে এসে বলল, “শব্দ দিয়ে মানুষ খুন করা যায় বোধহয় । পৃথিবী ধংস করা যায় কিনা, জানিনা” ।

শিশির বলল, “কুকুরের শ্রবণ শক্তি নাকি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী । তাহলে পাড়ার কুকুরগুলোর কি অবস্থা হয়েছিল, ভেবে দেখা উচিৎ” । তারপর হঠাৎ সিগারেটের প্যাকেট খুলে ঘনাদার দিকে বাড়িয়ে ধরল, “ঘনাদা, সিগারেট”।

ঘনাদা নিঃশব্দে একটা সিগারেট এমন ভাবে তুলে নিলেন যেন ‘দিচ্ছ তাই নিচ্ছি’ ।

ততক্ষণে অবশ্য বনমালির তৈরি ডিমর চপ ঘরে পৌঁছে গেছে । ঘনাদা না জ্বালানো সিগারেটটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে একটা চপ তুলে নিলেন । বললেন, “বুঝেই গেছি, একটু আগেই ডিমের চপ ভাজার শব্দ পেয়েছি” ।

গৌর বলল, “গন্ধ পেয়েছিলেন”?

ঘনাদা একটা তির্যক ভঙ্গিতে গৌরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “না গন্ধ নয়, আমি শব্দই বলেছি” ।

আমরা একটু অবাক হয়ে ঘনাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম । ঘনাদা চপটা শেষ করে দ্বিতীয়টা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, “এই যে মাইকের শব্দে তোমাদের কান মাথা হৃদপিণ্ড কী কী সব খারাপ হয়ে গেছে বলছিলে না ? শব্দ

যে কী কী কাণ্ড করতে পারে, তোমরা সেই কথা কল্পনাও করতে পারবে না । সেই শব্দ সম্বন্ধে আমি প্রথম জানতে পারি জাপানের আসুকা শহরে ।

গল্পের গন্ধ পেয়ে শিশির লাইটার বার করে ঘনাদার সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিল ।

ঘনাদা একটা লম্বা সুখটান দিয়ে বললেন, "তোমরা শুধু শুনতে পাওয়া শব্দের কথাই বলো, শব্দহীন শব্দের কথা জানো"?

গৌর বলল, "যেমন যে কথা মুখে বলা হয় সেটা সবাই শুনতে পায় । শব্দ । আবার যে কথা মনে মনে বলা হয়, কেউ শুনতে পায় না । শব্দহীন শব্দ । তাইতো ঘনাদা"?

গৌরটা বিপদ তৈরি করছে দেখে আমরা সবাই মিলে প্রায় একযোগে বলে উঠলাম, "যা জানিস না, তাই নিয়ে কথা বলছিস কেন"?

ঘনাদা একবার তির্যক দৃষ্টিতে গৌরের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেন বোঝালেন, গৌরটা নিতান্তই বালখিল্য । বোঝা গেল, বিপদ কেটে গেছে ।

ঘনাদা এগিয়ে চললেন, "সেবারে দুটো নিমন্ত্রন একসঙ্গে পেয়েছিলাম । একটা ওসাকা শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে নারা শহরে মিস্টার আৎসুশি আমাকে নিমন্ত্রন করলেন একটা বিশেষ কারণে । সেটা জানতে পেরে আসুকা থেকে ডঃ হাচিরোও আমাকে নিমন্ত্রন পাঠালেন ওনার কাছে কয়েকটা দিন ঘুরে আসার অনুরোধ করে ।

ওসাকা স্টেশন থেকে মিঃ আৎসুশি আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন । ৩০ কিলোমিটার যেতে মিনিট কুড়ি লাগে । তার ফাঁকেই আৎসুশি জানালেন তিনি কেন আমাকে নিমন্ত্রন করেছেন । তখনই জানলাম, এই নারা শহর এবং আশে পাশের কয়েকটা অঞ্চলে নাকি উঁচু উঁচু বাড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধুলিস্মাৎ হয়ে যাচ্ছে । আমি ভুমিকম্পের কথা তুলতেই আৎসুশি জানালেন, "যে যে বাড়িগুলো যখন যখন ভেঙ্গে পড়েছে, তখন ভুমিকম্পের চিহ্নমাত্র ছিল না । যদিও এটা ঠিক যে জাপান ভুমিকম্প প্রবন অঞ্চল, যে জন্যে আগে সব বাড়িই কাঠের তৈরি হত । কিন্তু এখন স্থাপত্যবিদ্যার দৌলতে পাকা বাড়ি, এমনকি হাইরাইজও হয়েছে প্রচুর । তুমি তো জানো, আমি স্থাপত্যবিদ । অনেক উঁচু বাড়ি বা হাইরাইজ আমারই তত্ত্বাবধানে তৈরি । সাধারণ ভুমিকম্পে সেই বাড়ির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না । সেগুলো টাই-বিম পদ্ধতিতে এবং তার সঙ্গে ভিতে স্প্রিং ও বেয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে ওগুলো অনেকটা কম্পন সহ্য করতে পারে" ।

"কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয় । ভুমিকম্পের বিন্দুমাত্র চিহ্নমাত্র না থাকা সত্বেও কি করে বাড়িগুলো ভেঙ্গে পড়লো বা বলা ভালো ক্রমাগত ভেঙ্গে চলেছে --- সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে আর্কিটেক্টরা চেষ্টা করেও সফল হননি । ভেঙ্গে পড়া

বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো সরকারি অফিসও রয়েছে । ফলত, বহু মহামুল্য কাগজপত্র ও দলিল নষ্ট হয়ে গেছে । সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ভীষণ রকম অবাক হয়েছি কারণ যে বাড়ি ৬ বা ৭ রিখটার মাত্রাতেও ভেঙ্গে যাওয়ার কথা নয়, বিনা কম্পনে সেগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে কি করে"?

আমি আৎসুশিকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কোন কারণ থাকার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

আৎসুশি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললো, "শুধু ভেঙ্গে পড়াই নয়, কিছু কিছু বাড়িতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যাচ্ছে । আর সেই আগুনকে আগুন না বলে ভয়াবহ বিস্ফোরক অগ্নিকান্ড বলা উচিৎ । এমনকি দুটো দমকলের অফিসও পুড়ে শেষ হয়ে গেছে । তোমরা যেটাকে মহাফেজখানা বলো, জাপানের তেমনি নানারকম সরকারি তথ্য, দলিল দস্তাবেজ সম্বলিত অফিসটিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।

বিকেলের মধ্যেই নারা শহরের আৎসুশির বাড়িতে পৌঁছলাম । আৎসুশির স্ত্রী এমিকো জাপানি কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন । ওদের একমাত্র ছেলে টোকিওর কাছে কোথায় যেন থাকে, মাসে একবার বাড়িতে আসে ।

সন্ধ্যেবেলায় ড্রইংরুমে বসে যখন আমি আর আৎসুশি কথা বলছিলাম, তখনই আৎসুশি জানালো যে এই উদ্ভট রহস্য ভেদ করার কোন উপায় আমি ভাবতে পারছি কিনা ? আমাকে নিমন্ত্রন জানানোর এটাও একটা কারণ ।

জানালাম, আমাকে ভাঙা আর পোড়া বাড়িগুলো একটু দেখতে হবে । তারপর দেখা যাক কোন উপায় বার করা যায় কিনা ।

আমরা অনেকগুল ভেঙ্গে পড়া বাড়ি দেখলাম । পুড়ে যাওয়া দমকল কেন্দ্র আর সরকারি অফিসও দেখলাম । মনে হল কেউ যেন খেলনা বাড়ির মত সেগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ।

তবে সত্যি কথাটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল – তিন চারদিন ধরে অনেক দেখে শুনে, আরও অনেক ভেবেও আমি কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না । শুধু ঐ ভেঙ্গে যাওয়া দমকলের অফিসের ধ্বংসাবশেষে সাদা সাদা ফেনা জাতীয় বস্তু ছড়িয়ে আছে, সেটা চোখে পড়লো ।

ইতিমধ্যে আসুকা থেকে পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ হাচিরোর ফোন এসেছে, জানতে চেয়েছে আমি কবে যাচ্ছি ইত্যাদি । আৎসুশি জানালেন, হাচিরো খুব ভালো বেহালা বাজায় । ইদানিং নাকি ভারতীয় রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে আগ্রহ জেগেছে । শিখেওছে অনেকটা । তুমি ভারত থেকে এসেছো, তাই তোমাকে ওর বাজনা শোনাবে বলে উদগ্রীব হয়ে আছে । আৎসুশিকে বললাম যে তাকে যখন ঐ সমস্যা নিয়ে এই মুহূর্তে কোন সাহায্য করতে পারলাম না, তখন আমাকে ভাববার জন্যে দুতিনদিন সময় দাও । কদিন না হয় হাচিরোর কাছেই ঘুরে আসি ।

আৎসুশি বলল, "আমি আর্কিটেক্ট হয়েও তো কিছু কারণ খুঁজে পেলাম না, তোমাকে আর দোষ দেবো কী করে"?

পরের দিন সকালেই আৎসুশি আমাকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে হাচিরোর কাছে পৌঁছে দিল ।

হাচিরো বাড়ির সামনের লনে একটা চেয়ার নিয়ে বিষন্ন মুখে বসে ছিল । আমাদের দেখে খুব খুশী হল । ভেতরে নিয়ে গেল । আৎসুশি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি অমন মনমরা হয়ে বসেছিলে কেন"?

হাচিরো বলল, "সে অন্য ব্যাপার । আমি ছোটবেলাবেলা থেকেই রিউম্যাটিক হার্ট-এর রুগী । প্রতিমাসে আমাকে একটা ইনজেকশন নিতে হয় । যে ছেলেটা ইনজেকশন দেয়, প্রতিমাসে ঠিক সময়ে আসে । এ মাসে তার কী হল, কে জানে ! আসছেও না, মোবাইলও বন্ধ । অথচ আমার এক মাস পেরিয়ে আরও দশ দিন এগিয়ে গেছে । তার পাত্তা নেই ।

আমি হাচিরোর পিঠে হাত রেখে বললাম, "কোন চিন্তা নেই । আর দুএকদিন দেখো, না হলে আমিই তোমায় ইনজেকশন দিয়ে দেবো"।

হাচিরো আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ইনজেকশন দেওয়া বেশ শক্ত, সবাই পারে না"।

বললাম, "জানি হাচিরো, আমি জানি এটা সাধারণ ইনজেকশন নয় । বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন[1] যেহেতু ডিপো পেনিসিলিন, তাই ২০ গেজ নিডল দিয়ে ডিপ গ্লুটিয়াল মাসলে দিতে হয় ।

হাচিরো একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ । তুমি জানো এটা কিভাবে দিতে হয়"?

উত্তর দিলাম না, একটু মুচকি হেসে মাথা নোয়ালাম ।

আৎসুশি বলল, "আমি তাহলে আসি বন্ধু"। হাচিরোকে জিজ্ঞেস করলো, "ওকে নিতে কি আমি আসবো, নাকি ...."

হাচিরো মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যে ওকে আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিলে, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ । ফেরার সময় আমি ওকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেবো"।

হাচিরোর ঘরে দেখলাম নানা রকম বেহালা সাজানো রয়েছে । কোনটা বড়, কোনটা মাঝারি আবার কোনটা বেশ ছোটো । জিজ্ঞেস করায় জানালো, "মন্দ্রসপ্তকে বাজানোর জন্য বড় বেহালা, আর মধ্য সপ্তকের জন্য মাঝারিটা । যদি ইচ্ছে হয় তার সপ্তক থেকে শুরু করবো, তখন ছোটটা বাজাই ।

বললাম, "তুমি নাকি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়েও চর্চা করছো"?

হাচিরো জানালো, "পাশ্চাত্য সঙ্গীত আর আমাদের প্রাচ্য সঙ্গীতই বাজাতাম । যখন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনলাম, মনে হল, হাতে স্বর্গ পেয়েছি । এমন বিচিত্র ভাবের সুর, বিভিন্ন রাগ শুনে মনে হল, আমি এই সঙ্গীতেরই খোঁজে ছিলাম । তারপর ভারতীয় স্বরলিপি পড়তে শিখলাম । তোমাদের দেশের ওস্তাদ আর পণ্ডিতদের বাজনা শুনলাম ।

যেন নেশার মত পেয়ে বসলো । গত পাঁচ সাত বছর ধরে তাই ঐ সঙ্গীত আয়ত্ব করার চেষ্টা করছি । কিছুটা শিখেছি । তবে তোমাদের ঐ রাগ সঙ্গীতের ভাণ্ডার তো অফুরন্ত – বোধহয় এক জীবনে শেষ করা যায়না ।

একজন জাপানীর কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি এই শ্রদ্ধা দেখে অভিভুত হলাম । সত্যিকারের সঙ্গীত রসিক হলেই তবে এটা সম্ভব । এ তো ঐ বিশ্বকর্মা পুজোয় বাজানো 'গলতিসে মিস্টেক' নয় ।

জিজ্ঞেস করলাম, "হাচিরো, তুমি ভারতীয় স্বরলিপি পড়তে পারো"?

হাচিরো বলল, "হ্যাঁ, শিখে নিয়েছি । তবে কি জানো ডস, স্বরলিপিতে শুধু রাগ সঙ্গীতের কাঠামোটা বোঝা যায় । মীড় বা গমকের কাজ শুনে শিখতে হয় । তাই আমি প্রচুর রাগ সঙ্গীত শুনি । তোমাদের ভারতীয়দের কাছে এ যে কী অমুল্য সম্পদ আছে – ভাবা যায় না ।

হাচিরো বিয়ে থা করেনি । একাই থাকে । দুটো শয়ন কক্ষ ছাড়া এই বাইরের ঘরটা ওর সঙ্গীত কক্ষ । এ ছাড়া এর পাশেই ওর ল্যাবরেটারিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সরঞ্জাম ও বই পত্তর । একটা সেলফে তো পদার্থবিদ্যার বই ঠাসা । আবার অন্য একটা সেলফে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বই, স্বরলিপির বাঁধানো খাতা আর কিছু ডায়েরী ।

হাচিরোর কাছ থেকে জানতে পারলাম, ওর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মুল বিষয় 'শব্দ', 'মিউজিক থেরাপি' ইত্যাদি । একজন পদার্থবিজ্ঞানী যিনি শব্দ নিয়ে রিসার্চ করেন, আবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করেন --- তিনি যে মিউজিক থেরাপির ওপর কাজ করবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক ।

খাবার সময় যেটা দেখলাম, তাতে উৎফুল্লই হলাম । অক্টোপাস আমার অন্যতম প্রিয় খাবারের পদ । আগেও খেয়েছি । আজ হাচিরো আবার খাওয়ালো । খেতে খেতে নানান গল্প চললো । বিশেষ করে মাছ নিয়ে । হাচিরোর মতে পূর্বভারতের ভোজন অভ্যাস জাপানীদের খুব কাছাকাছি । কারণ মাছের প্রতি আকর্ষন ।

ঘনাদা শিশিরের প্যাকেট থেকে নিজের অজান্তেই আরও একটা সিগারেট তুলে নিলেন, ধরালেন, এক বুক ধোঁয়াও ছাড়লেন । এই ফাঁকে গৌর জিজ্ঞেস করলো, " সেটা ঠিক । বাঙালিরাও তো মাছ প্রিয় । তা ঘনাদা, আপনি অক্টোপাসের ঠ্যাং চিবলেন ?

শিশির গৌরকে থামাবার চেষ্টা করলো, " হ্যাঁ, তুই যেমন মুরগীর ঠ্যাং-এ কামড় দিস ।

গৌর মন্তব্য করলো, "আহা মুরগিরও যদি আটটা পা হত -- !! কতগুলো লেগপিস হত, সেটা ভাব"।

এই সব বোকা বোকা আলোচনাকে ঘনাদা এড়িয়ে গেলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত বানীর নৌকো এগিয়ে চললো ।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় হাচিরো বেহালা নিয়ে বসলো । একমাত্র শ্রোতা আমি । সেদিন আমাকে ভৈরবী রাগ বাজিয়ে শোনালো । বড় ভালো বাজনার হাত হাচিরোর । সত্যিই মুগ্ধ হলাম । এক জাপানীর হাতে ভৈরবীর বিষন্ন ভোর যেন ধরা দিল । রসিকতা করে বললাম, "তুমি বৈজ্ঞানিক না হয়ে সঙ্গীত শিল্পী হলেও তোমার রীতিমত নামযশ হত"।

প্রশংসায় খুব খুশী হল হাচিরো । ওর কুতকুতে চোখ আর চ্যাপ্টা নাকে এমন ভাবে বিনয়ের হাসি হাসলো, মনে হল যেন এক নিষ্পাপ শিশুর আনন্দ দেখতে পেলাম ।

পরের দিন সকালে বাথরুমে প্রায় এক ঘণ্টা কাটালো হাচিরো । আর ঐ এক ঘণ্টা ধরেই ওর গুনগুন করে গাওয়া গান আমার কানে আসছিল । বেরিয়ে জানালো, "ডস, দুঃখিত, বাথরুমে আমার একটু সময় লাগে । তারপর হাচিরো আমাকে নিয়ে বেরোল । কাছাকাছি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বুদ্ধ মন্দির আসুকা ডেরা দেখতে গেলাম । তারপর তাচিবানা ডেরা, ইসিবুতাই কোফুনও দেখলাম । লাঞ্চ সারলাম মাঝপথে একটা রেস্টুরেন্টে । আমি চপসটীক দিয়ে খাওয়ায় স্বচ্ছন্দ দেখে হাচিরো খুব খুশি হল ।

সন্ধ্যে বেলায় হাচিরো আজ আবার বেহালা নিয়ে বসলো । আজ শোনালো 'রাগ বসন্ত' । যথারীতি আজও খুব ভালো বাজালো । বাজনা শেষ করে বেহালাটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে হাসি মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকলো ।

বললাম, "অপূর্ব হয়েছে । তুমি খুব ভালো বাজাও – যে কোন ভারতীয় ওস্তাদজির থেকে কোন অংশে নয় । তবে এক জায়গায় একটু গণ্ডগোল হয়েছে । তুমি বোধহয় ভুল করে একবার পঞ্চম ছুঁয়ে ফেলেছো । 'বসন্ত' রাগে কিন্তু আরোহ পঞ্চম বর্জিত ।

অবাক হয়ে হাচিরো আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বুঝতে পেরেছ ? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তীব্র মধ্যম ছুঁতে গিয়ে একবার পঞ্চমে আঙুল ঠেকে গেছে । বাজাবার সময়ই আমি বুঝতে পেরেছি । কিন্তু ঐ সামান্য ভুলটাও তোমার কানে গেছে ? সত্যি ডস, তোমার মত বোদ্ধা শ্রোতাকে বাজনা শুনিয়েও আনন্দ । বোঝাই যাচ্ছে, তুমি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গুলে খেয়েছো ।

হাচিরোকে বললাম, "আসলে রবি আর ভিজির সঙ্গে এই বিষয়ে আমার নানা আলোচনা হয়েছে । তাঁরাও আমার সঙ্গীত বোধের প্রসংসা করেছেন"।

হাচিরো জিজ্ঞেস করলো, "রবি আর ভিজি কে"?

--"রবি মানে ঐ তোমরা যাকে রাভি অর্থাৎ রাভিশঙ্কর বলো । সেতার বাদক । আর ভিজি মানে ভিজি যোগ – বেহালার ওস্তাদজি"।

আর তখনই শিবুর সেই খুকখুকে কাশিটা ফিরে এলো । শিশির বলে উঠল, “এই কাশীরাম দাস, তুই কি কাশির ওষুধটা ঠিক মত খাচ্ছিস না”? এবং এটা বলার ফলে শিবুর কাশিটা আরও বেড়ে গেল এবং কাশতে কাশতে দালানে চলে গেল । সেখানে গিয়ে বেশ করে গলা ছেড়ে কেশে নিল । যদি কারো মনে হয় যে ঐ কাশিটা অনেকটা চাপা হাসির মত, তাহলে আমারা কোন মন্তব্য করবো না ।

ঘনাদা কাশীরাম দাসকে পাত্তা না দিয়ে আবার শুরু করলেন, “তারপর ঐ সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন যেন রাগ সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছি ।

বললাম, “জানো, কথিত আছে, আমাদের দেশে তানসেন নামে একজন গায়ক নাকি দীপক রাগে গান গেয়েছিলেন, আর তাতেই নাকি আগুন লেগে গিয়েছিল । তারপর তাঁর পুত্র বিলাস খান নাকি টোড়ি রাগ গেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে সেই আগুন নিভিয়েছিল । যদিও এটা গল্পই মনে হয় । সত্যি তো আর এমন হয় না ।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল হাচিরো । বলল, “কে বললো হয় না ? শব্দ দিয়ে আগুন জ্বালানো মোটেই অসম্ভব নয় । শব্দের ক্ষমতা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই । বলেই ছোট বেহালাটা নামিয়ে আনলো । সামনের টুলের ওপর একটা কাঁচের গ্লাস রাখলো । আর বেহালাটা ধরে আমাকে বললো, “দেখো কী হয়”? --- বলেই সেই ছোট্ট বেহালায় ছড় টানলো; একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এলো । তারপর ধীরে ধীরে সুরটাকে আরও ওপর দিকে নিয়ে গেল । যখন ঐ বেহালার আওয়াজ তীক্ষ্ণতার চরমে পৌঁছেছে, হঠাৎ কাঁচের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো – কাঁচ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে ।

হাচিরো বললো, “বুঝলে শব্দের অভিঘাত কাকে বলে”?

আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । টিনটিনের গল্পে সিনিওরা ক্যাস্টাফিয়রা গান গেয়ে একটা ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলছিল – পড়েছি । তবে ওটাকে বানানো গল্পই ভেবেছিলাম । আজ তো চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম ।

হাচিরো বলল, “ডস, তুমি তো নানান দেশ ঘুরেছো । ইংল্যান্ডের ব্রাউটন ঝুলন্ত সেতুর কথা শোননি ? **১৮৩১** সালে একদল সৈনিক ঐ ব্রিজের ওপর দিয়ে মার্চপাস্ট করার সময় ব্রিজটা ভেঙ্গে পড়েছিল । সেই থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ম ছিল, কোন ব্রিজের ওপর কোন সৈন্যদল মার্চপাস্ট করতে পারবে না । সাধারণ ভাবে হাঁটতে হবে ।

১৮৫০ সালে ফ্রান্সের মেইনে নদীর ওপর অ্যাঞ্জার ব্রিজ ঠিক ঐ একই কারণে ভেঙ্গে পড়েছিল ।

প্রত্যেক স্থাপত্যের একটা নিজস্ব কম্পাঙ্ক থাকে । যদি সেই কপম্পাঙ্কের সঙ্গে অতিরিক্ত বাইরের কোন কম্পাঙ্ক মিলে যায় তাহলে অনুরণনএবং দোলন সৃষ্টি হয় এবং ঐ অনুরননের এবং দোলনের অভিঘাতে কোন ব্রিজ বা বাড়ি বা যে কোন ইমারত ভেঙ্গে যেতে পারে । সেটা যে শব্দই হতে হবে তার কোন মানে নেই । যে কোন কম্পন বা তরঙ্গ বা দোলন[2] – এমনকি শব্দহীন শব্দও হতে পারে ।

মনে মনে স্বীকার করতেই হল যে হাচিরোর এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান । তবু আমি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, "অনুরণন কম্পাঙ্ক মিলে গেল, বেশ সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল । কিন্তু সেটা দিয়ে তো তানসেনের গান গেয়ে আগুন জ্বালানোর কোন ব্যাখ্যা হয় না ।

"হয়,হয়", হাচিরো বলে উঠল, "আগুন নেভানোর জন্য অগ্নি নির্বাপক ফেনা বা ফোম ব্যবহার করা হয়, জানোতো ?

"জানি" আমি বললাম, "তাই দিয়ে আগুন নেভানো হয়, জ্বালানো হয় না"।

হাচিরো এবার গলা তুলে বলল, "হয়, সেটাও হয় । অগ্নি নির্বাপক ফেনার সিলিন্ডারের মধ্যে যদি এমন কোন শব্দ বা শব্দের চেয়ে বেশী কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ ঠিক মত যোগ করা যায়, তাহলে ঐ অগ্নি নির্বাপক ফেনার তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রি ফারনেহাইট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে[3] । অর্থাৎ তোমাদের হিসেবে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস । সূর্যের করোনার কাছাকাছি তাপমাত্রা । বুঝতে পারছো, তাতে কী হতে পারে ? তার সঙ্গে ঐ ফোম ভেঙ্গে গিয়ে কারবন ডাই অক্সাইড আর বাস্প উৎপন্ন হয় – ফলে ভিতরের চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যায় । তখন ওটার বিস্ফোরণ হয় । এবার আন্দাজ কারো ঐ তাপমাত্রায় কোন বিস্ফোরণ হলে কী হতে পারে । আগুন কেন, আগুনের বাব কিম্বা ঠাকুরদাও লেগে যেতে পারে"।

পদার্থবিজ্ঞানীর কথা শুনে ভেতরে ভেতরে অবাক হলেও, বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না । উল্টে কথা ঘোরানোর জন্য আবার ঐ রাগ সঙ্গীতের আলোচনায় ফিরে গেলাম । হাচিরো জানালো, তারের বাজনাই ওর বেশী পছন্দ । তবে ভারতীয় সেতার বা সরোদ ও বাজাতে পারে না, কারণ ওটা গুরুমুখী শিক্ষা । তাই বেহালাই ওর সঙ্গী ।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—নানা রকম ভাবনা মাথায় এলো । কিছুটা বুঝতে পারলাম । কিন্তু পুরোটা বুঝলাম না । এ যেন সেই যেটা খুঁজছি, অযাচিত ভাবে সেটাই এসে ধরা দেবার চেষ্টা করছে । তাই পরের দিন অন্য পথ নিতে হল ।

সকালে যখন ও বাথরুমে ঢুকলো, তখন ওর ল্যাবে গিয়ে ওর রিসার্চ পেপারের খাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম । সবই জাপানী ভাষায় লেখা । তবে অবাক লাগলো, একটা ফাইলের সব পাতায় কোরিয়ান ভাষায় লেখা দেখে । ফাইলটার কয়েকপাতা পড়েই যা বোঝার তা বুঝে গেলাম । হাচিরো বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই আবার সব যথাযথ ভাবে রেখে বাইরের ঘরে বসে ওর স্বরলিপির খাতাগুলো এমন ভাবে দেখতে লাগলাম যাতে ও বেরিয়েই ভাবে যে আমি ঐ স্বরলিপি নিয়েই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম ।

সকালে যখন দুজনে জলখাবার খাচ্ছি তখন হাচিরো নিজেই প্রসঙ্গটা তুললো । বলল, "বুঝলে ডস, ঐ ইনজেকশনের ছেলেটার যে কী হল, কে জানে ? তুমি বলেছিলে --

কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, “ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম । আজকে বিকেলে তোমাকে ইনজেকশনটা পুস করে দেবো ।

সকালে আবার একটু এদিক ওদিক বেড়ানো হল । বিকেলে ফিরে এসে কথা রাখলাম ।

ঈথারের শিশি, সিরিঞ্জ, ডিস্টিলড ওয়াটার আর বেঞ্জাথিন পেনিসিলিনের ভায়াল হাচিরোর ল্যাবেই ছিল । আমি ডিস্টিলড ওয়াটারের আম্প্যুল ভেঙ্গে জলটা সিরিঞ্জে টেনে নিলাম । তারপর অনেকটা জল সিরিঞ্জ থেকে ফেলে দিয়ে আমার পকেটে থাকা স্কপোলামাইনের অ্যাম্প্যুল থেকে বেশ কিছুটা ওষুধ টেনে নিয়ে বেঞ্জাথিন পেনিসিলিনের ভায়ালে ভরে দিলাম । কিছুক্ষণ ধরে ঝাঁকাতেই ওষুধগুলো সব একসঙ্গে মিশে গেল । তুলোয় ঈথার নিয়ে বাইরের ঘরে হাচিরোর কাছে গেলাম । ওকে উল্টো করে শুইয়ে ওর কোমরে ধীরে ধীরে পুরো মিশ্রণটা পুশ করে দিলাম । একটু ব্যাথা লাগলো । লাগেই । বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন নিলে শুধু ব্যাথা লাগে না – দুএকদিন ব্যাথা থাকেও । কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে হাচিরো ধীরে ধীরে উঠে বসলো ।শুধু বলল, “ধন্যবাদ ডস” । তার ব্যাথার কারণে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল । আমিও স্কপোলামাইনের কাজ শুরু হওয়া অবধি অপেক্ষায় রইলাম । [4]

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো, আমি স্কপোলামাইনই বলেছি । স্কপোলামাইনকে বলা হয় ট্রুথ-সিরাম । এটা শরীরে প্রবেশ করলে কেউ আর মিথ্যে কথা বলতে পারে না । সব সত্যি কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধৃত গুপ্তচরদের পেট থেকে কথা আদায় করার জন্য এটা ব্যবহৃত হত ।

যাইহোক মিনিট পনেরো কুড়ি পরে প্রশ্ন শুরু করলাম । সেই প্রশ্নগুলো থেকে যা জানতে পারলাম তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই ভয়াবহ ।

হাচিরো ওর আসল নাম নয় আর ও জাপানীও নয় । ওর আসল নাম জি-হুন আর ও কোরিয়ার মানুষ । জি-হুন জাপানে এসে জাপানী নাম নিয়ে বসবাস করতো একটা বিশেষ উদ্দেশ নিয়ে – আর সেই উদ্দেশের নাম প্রতিশোধ ।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রচুর কিশোরী ও যুবতীকে ধরে এনেছিল-- কাউকে চাকরির লোভ দেখিয়ে, কাউকে টাকা দিয়ে বা কাউকে জোর জবরদস্তি করে । ঐ ধরে আনা মেয়েদের জাপানী সৈনিকদের বেসক্যাম্পগুলোর কাছে এক একটা বাড়িতে আটকে রাখা হত । ওদের কাজ ছিল জাপানী সৈনিকদের আনন্দ দান করা । বা বলা ভালো, ওদের এই কাজে বাধ্য করা হত । অবাধ্য হলে জুটতো মারধোর, খেতে না দেওয়া, কিম্বা সিগারেটের ছেঁকা ।

এমন মেয়েদের মধ্যে একজন ছিল জি-হুনের ঠাকুরদার বোন । মানে ওর বাবার পিসি । তাকেও ঐ জঘন্য কাজ করানর জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছিল । বাধা দেওয়ার উপায় ছিল না কেননা সেটা করা হয়েছিল বন্দুকের নলের

সামনে । ঐ ঠাকুরদার বোন কোথায় ছিল, কেমন ছিল – জানার কোন উপায়ও ছিল না । একটা বাড়িতে প্রহরা বেষ্ঠিত হয়ে জাপানী সৈনিকদের দাবী মেটাতে হত । চার বছর পরে সেই মেয়ে যখন ফিরে আসে, তখন সে আর কুড়ি বছরের যুবতী নয় – ফিরে এসেছিল শীর্ণকায়, নুয়ে পড়া, সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন, আর শরীরের ভেতরে আর বাইরে বিষাক্ত জীবানুর ক্ষত সহ এক কুড়ি বছরের বৃদ্ধা । তারপর অবশ্য বেশীদিন বাঁচেও নি সে মেয়ে ।

জি-হুন এসব গল্প শুনেছে বাবা মায়ের কাছে । সেই থেকে জাপানীদের ওপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায় । কি এক অদ্ভুত প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে সে জাপানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখে ঐ হাচিরো নাম নিয়ে । সবাই জানতো হাচিরো একজন বিখ্যাত জাপানী পদার্থ বিদ্যা বিশারদ । সবাই খুব সম্মান করতো ওকে ।

কিন্তু এতো বছরেও ওর মন থেকে সেই পুরনো প্রতিশোধ স্পৃহা যায়নি । শব্দ নিয়ে গবেষণা করতে করতে সে আবিষ্কার করে ছিল শব্দের (বা তরঙ্গ এবং কম্পনের) ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ।

ঐ বিষয় নিয়ে তার গবেষণা শুরু হল । তার গবেষনার বিষয় ছিল শব্দের অভিঘাতে কোন নির্মাণ, অর্থাৎ উঁচু বাড়ি বা ঝুলন্ত ব্রিজ অথবা যে কোন স্থাপত্য কী ভাবে ধ্বংস করা যায় । একটা যন্ত্র তৈরি করলো জি-হুন – যেটা দিয়ে সে যে কোন বাড়ি বা অট্টালিকার সংকট কম্পাঙ্ক(Critical Frequency) মাপা যায় । ফলে ঐ কম্পাঙ্ক বা তার উত্তর সপ্তক(Higher Octave)-এ কোন তীব্র শব্দ বা শব্দ-উত্তর (ultrasonic) কম্পন দিয়ে সেই বাড়ি বা স্থাপত্যকে সহজেই ধ্বংস করা সম্ভব ।

ওর দ্বিতীয় আবিষ্কার হল পরিবর্তনশীল কম্পাঙ্কের শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্র তৈরি করা ।

প্রথম যন্ত্রটার আকার ছিল একটা লম্বা স্মার্ট ফোনের সমান । আর শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্রটা আরও ছোট এবং এটা সঙ্গে টাইমার যুক্ত থাকতো । স্কপোলামাইনের প্রভাবে ঐ দুটো যন্ত্রই সে আমাকে দেখাতে বাধ্য হল, আর সেগুলি কি করে কাজ করে, সেটাও ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হল ।

আর তৃতীয়টা ছিল শব্দ-উত্তর তরঙ্গ প্রক্ষেপ যন্ত্র, যেটা দিয়ে সে অগ্নি নির্বাপক ফোম সিলিন্ডারের ভেতরে শব্দের আলোড়নে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে ।

মনে মনে ভাবলাম, আৎসুশি, তুমি যে কাজের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, তার উত্তর আমি বোধহয় পেয়ে গেছি । এক কোরীয় নাগরিকের প্রতিশোধ স্পৃহা এর মুল কারণ ।

স্কপোলামাইনের প্রভাব কমে আসতেই জি-হুন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো । এই ফাঁকে আমিও ঐ যন্ত্রগুলোর কার্যকারিতা আর ওর গবেষণা পত্রগুলোর ওপর চোখ বোলানর সময় পেলাম । রাতের খাওয়ার বাদ গেল । তবে সারা রাত্রি সময় পাওয়ার ফলে আমার একটু সুবিধে হল । রাতটা প্রায় বিনিদ্রই কাটলো আমার ।

মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্কপোলামাইনের প্রভাবে মানুষ যা কিছু প্রকাশ করে, সেটা আর পরে মনে থাকে না । সুতরাং পরদিন সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙলো, আগের মতই স্বাভাবিক ভাবেই আমার সঙ্গে কথা বার্তা বললো । আগের দিনের ওষুধের প্রভাবে কী কী বলেছে সেটা আর ওর মনে ছিল না ।

প্রাতঃরাশ খাওয়ার সময় আমি ওর সঙ্গীত প্রতিভার প্রশংসা করলাম । ওর মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ছুঁয়ে গেল । আমার মত বিজ্ঞ শ্রোতাকে বাজনা শুনিয়ে ও যে কতটা তৃপ্ত – সেটাও বোঝালো । তারপর বলল যে ওকে একটু নারা শহরে যেতে হবে, লাইব্রেরীতে নাকি ওর কাজ আছে । ওর প্রায় সারাদিনই লাইব্রেরীতে লেগে যাবে ।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা গ্রহণ করলাম । বললাম যে তার কাছে তিন চারটে দিন খুব আনন্দে কাটলো । এবার যদি ও আমায় অনুমতি দেয় তাহলে আজকেই আমি আৎসুশির কাছে ফিরে যেতে চাই ।

নিজেও সারাদিন থাকবে না, আমিও হয়ত একা একা বোর হব, এটা ভেবে জি-হুন রাজি হল । বলল নারা শহরে লাইব্রেরীতে যাওয়ার পথে ও আমাকে আৎসুশির বাড়িতে নামিয়ে দেবে । ফোন করে সেটা আৎসুশিকে জানিয়েও দিল ।

নারা শহরে আৎসুশির বাড়িতে পৌঁছে এক বাটি চা খেয়ে জি-হুন লাইব্রেরীর উদ্দেশে বেরিয়ে গেল । আমিও আৎসুশিকে বললাম গাড়িটা গ্যারাজ থেকে বার করতে ।

আৎসুশি অবাক হয়ে জানতে চাইলো কেন আমি গাড়ি বার করতে বলছি ।

বললাম, "তুমি আমাকে এক্ষুনি ওসাকা স্টেশনে পৌঁছে দেবে । আমি ওসাকা থেকে ট্রেন ধরে টোকিও পৌঁছে আজ রাতেই দেশে ফেরার ফ্লাইট ধরবো । ফ্লাইটের টিকিট আমি নেটে বুক করে নিয়েছি ।

আৎসুশি আরও অবাক হল । জানতে চাইলো, আমি কেন ওদের বাড়িতে আরও দুএকদিন থাকতে পারি না ।

বললাম, "আৎসুশি, গাড়িতে যেতে যেতে তোমায় সব বলবো"।

প্রচণ্ড অবাক হলেও আৎসুশি সম্মত হল । ওর স্ত্রী এমিকোর থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম । গাড়ি চলতে শুরু করলো । তখন আৎসুশিকে বাড়ি, দমকল দপ্তর এবং বিভিন্ন সরকারী অফিস ভেঙ্গে যাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করে বললাম । হাচিরো জাপানী নয় শুনে আরও বিস্মিত হল । আর হাচিরো (বা জি-হুনের) কাণ্ডকারখানা শুনে বোধহয় বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছলো ।

বলল, " ডস, এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি । কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে কি সমস্যার সমাধান হবে ?

বললাম, "আমি কিন্তু আমার ভয়ের কারণে পালিয়ে যাচ্ছি না । জি-হুনকে সামলানোর ক্ষমতা আমার আছে । আমার উপস্থিতি যাতে তোমাদের কোন ক্ষতি না করে, তাই জন্যে আমি চলে যাচ্ছি । কারণ জি-হুন ভীষণ ধুর্ত

এবং ক্ষতিকারক । আর তুমি সমাধানের কথা বলছিলে । যাতে সমাধান হয়, তার ব্যবস্থা আমি কিছুটা করে এসেছি । কাল রাত্রেই আমি ওর যন্ত্র দিয়ে ওর বাড়ির সংকট কম্পাঙ্ক নির্ণয় করেছি । একটা শব্দ প্রক্ষেপ যন্ত্রকে সেই কম্পাঙ্কে সেট করেছি । আর জি-হুন যখন গাড়ি বার করছিল, তখন ঐ যন্ত্রের টাইমারে কুড়ি মিনিট সময় সেট করে আমরা বেরিয়ে এসেছি তোমার বাড়ির উদ্দেশে । এতক্ষণে তোমাদের হাচিরোর, মানে জি-হুনের বাড়ি ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে । তার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে ওর গবেষণা পত্র আর সব যন্ত্রপাতি । কিছুই আর অবশিষ্ট নেই । জি-হুন যখন সন্ধ্যবেলায় বাড়ি ফিরবে – আমিও ততক্ষণে টোকিও বিমান বন্দর থেকে ভারতের উদ্দেশে আকাশযানে উঠে গেছি ।

ওসাকা স্টেশনে পৌঁছেও আৎসুশি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল । বলল, "কিন্তু যখন এগুলো একবার করেছে, তখন আবার তো অমন ধ্বংসাত্মক সৃষ্টি করতে পারে । তখন কী হবে ?

ব্যাগ থেকে ফাইলটা বার করে ওর হাতে দিলাম । বললাম, "এইটা সেই কোরিয়ান ভাষায় লেখা ওর ঐ শয়তানী গবেষণার ফাইল । এটা তোমাদের জাপান প্রশাসনের হাতে পৌঁছলেই জি-হুনের শ্রীঘর প্রবেশ কেউ আটকাতে পারবে না । সম্ভবত, এমন শত্রুকে জাপান প্রশাসন সারা জীবনের মত বন্দী করেই রেখে দেবে ।

বলেই আমি ওসাকা প্লাটফর্মের দিকে হাঁটা লাগালাম – হতবাক আৎসুশি আমাকে ধন্যবাদ জানাবারও সময় পেল না ।

References:

[1] **Benzathine benzylpenicillin**, also known as benzathine penicillin G, is an antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.[1] Specifically it is to treat strep throat, diphtheria, syphilis, and yaws. It is also used to prevent rheumatic fever. It is given by injection into a muscle. more at: https://en.wikipedia.org/wiki/Benzathine_benzylpenicillin

[2] **Why Do Soldiers Break Stride On A Bridge**? If the soldiers march at the same frequency as the natural frequency of a hanging bridge, resonance occurs and the bridge starts to oscillate vigorously resulting in the collapse of the bridge. More at: https://en.wikipedia.org/wiki/Angers_Bridge

[3] **The destructive power of sound waves**: "Sonolysis relies on the process of Cavitation for its success," Keswani said. "Under certain conditions, sound waves cause the formation of small bubbles that rapidly implode and release an intense shock wave that produces enormous amounts of heat energy and a variety of highly active radicals, which can completely destroy adjacent material." More at: https://phys.org/news/2013-12-destructive-power.html